উদারনীতিক ধ্যান-ধারণা ও সমতাবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তাঁরাও নারীবাদী আন্দোলনকে সদর্থকভাবে প্রভাবিত করেন। ভারতীয় সমাজে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য বিষয়টি ইতিহাসগতভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে আধুনিক ভারতের সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত নারী জাতির মর্যাদা ও অবস্থানগত বিবর্তন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তন, প্রক্রিয়া প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদদের আগ্রহের আলোচনার এলাকা হিসাবে সুবিদিত। স্বভাবতই সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সামাজিক আন্দোলনের আলোচনায়ও আগ্রহী হন। কারণ সামাজিক আন্দোলন হল একটি সংগঠিত সমষ্টিগত উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী সমাজে পরিবর্তন আনতে বা প্রতিহত করতে চায়। নারী আন্দোলন হল সামাজিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। এই আন্দোলন সমাজের বিদ্যমান বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায়। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি সুদীর্ঘকাল ধরে নারী জাতিকে অবদমিত করে রেখেছে। তবে নারী আন্দোলন সঞ্জাত পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া নারী জাতির বিভিন্ন অংশকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

৭.২ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সংস্কার আন্দোলন এবং নারী জাতির বিষয়াদি (Reform Movement and Women's Issues in the 19th and Early 20th Centuries)

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নারী জাতির উপর বিবিধ পীড়নমূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহের অস্বীকৃতি প্রভৃতি। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমী উদারনীতিক মতাদর্শের বিকাশ ও বিস্তার, খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক পরিবর্তন এবং ধর্মীয় সংস্কারের জন্য বিবিধ সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল জাত-পাতের ব্যবস্থার সংস্কার, মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থার উন্নতি, নারীশিক্ষার প্রসার, সামাজিক ও আইনগত অসাম্য ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাদির বিলোপ, বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রভৃতি।

সমাজসংস্কারকদের ধারণা হয়েছিল যে, নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার দরকার। তা হলে শিক্ষিত স্বামী ও নিরক্ষর স্ত্রীর মধ্যে অলপনেয় ব্যবধান হেতু পারিবারিক অবক্ষয় আটকানো যাবে এবং আরোপিত পীড়নমূলক নিগড় থেকে অসহায় মহিলাদের রক্ষা করা যাবে। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সুবাদে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে সংস্কার আন্দোলনসমূহ পুরুষদেরই নেতৃত্বে এবং মহানগরীগুলিতেই সংগঠিত হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ সমাজে মহিলাদের দুরবস্থার মূল ও গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহকে তুলে ধরেছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি।

ব্রাহ্মসমাজ || ১৮২৫ সালে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী জাতির বিরুদ্ধে বিবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম-নিষেধ এবং কুসংস্কার সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে সবের মূল নিহিত ছিল ধর্মের মধ্যেই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধতা, প্রভৃতি। ব্রাহ্মসমাজ নারী জাতির বিরোধী সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং কুসংস্কারসমূহের অপসারণের বিরুদ্ধে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। মনে করা হয়েছিল যে, মহিলাদের সামগ্রিক মর্যাদার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার বিস্তার একটি বড় হাতিয়ার। কেশবচন্দ্র সেন বাড়ীতেই মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার উপর জোর দেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য-সমর্থন দাবি করা হয়। নারীদের নিয়ে 'বামাবোধিনী' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। গোঁড়া হিন্দুরা এসবের বিরোধিতা করে। তারফলে ১৮৭২ সালে 'Civil Marriage Act' প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয় এবং বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮। বর্তমানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স হল মেয়েদের ১৮ এবং ছেলেদের ২২। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে বাংলা এবং উত্তর ভারতের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রার্থনা সমাজ || ১৮৬৭ সালে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্যগত বিচারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রার্থনা সমাজের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বর্তমান। প্রার্থনা সমাজের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের মধ্যে এম.জি. রানাডে ও আর.পি. ভাণ্ডারকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ সালে বোম্বাইতে কার্ভে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। আর.জি. ভাণ্ডারকার এবং এন.জি. চন্দ্রভারকার এই বিশ্বদ্যিালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরবর্তী কালে SNDT মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায়। ১৮৬৯

সালে গঠিত হয় বোম্বাই বিধবা সংস্কার সংস্থা। এই সংস্থা ঐ বছরই প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করে। প্রার্থনা সমাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ভারতে।

আর্য সমাজ || ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্যসমাজ ছিল একটি ধর্মীয় পুনরুত্থানমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলন বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামি, মূর্তি পূজা, জাত-পাতের ভেদাভেদ ব্যবস্থা প্রভৃতির বিরোধিতা করা হয় এবং প্রাচীন ভারতে মহিলাদের গৌরবময় মর্যাদার উপর আলোকপাত করা হয়। জাত ব্যবস্থার সংস্কার সাধন নারী-পুরুষ উভয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা; আইন করে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ; বাল বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রভৃতির কথা বলা হয়। এই আন্দোলন বিবাহ বিচ্ছেদ এবং সাধারণভাবে বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিল। ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। এই সময় অনেক আর্য কন্যা পাঠশালা গড়ে উঠে। পারবর্তী কালে এগুলি কলেজে পরিণত হয়। নারী শিক্ষার বিস্তারে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য।

রাজা রামমোহন রায়, রাণাডে, দয়ানন্দ প্রমুখ সমাজসংস্কারক প্রাচীন ভারতে মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে অতিমাত্রায় উচ্ছসিত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জোতিরাও ফুলে, গোপালহরি দেশমুখ প্রমুখ জাতিভেদ ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের অভিযোগ অনুযায়ী মহিলাদের অবনমিত অবস্থার জন্য জাতব্যবস্থাই দায়ী। ফুলে অভিযোগ করেছেন যে, শূদ্র এবং নারী জাতিকে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। কারণ অশিক্ষিত থাকলে তারা মানবাধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে না এবং আইন, ঐতিহ্য ও প্রথানুসারে প্রদত্ত অধস্তন অবস্থান তারা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে।

মুসলমান মহিলা ও সামাজিক সংস্কার || ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান জনসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তবে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে পর্দা ব্যবস্থা এবং ধীর গতিতে শিক্ষার প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিকাশ ব্যাহত হয়। তারফলে মুসলমান মহিলাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের ব্যাপারে অনেকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভূপালের বেগম, আলীগড়ের সৈয়দ আহমেদ খান ও শেখ আবদুল্লা, লক্ষ্ণৌ-এর কামাত হোসেন প্রমুখ। ভূপালের বেগম ১৯১৬ সালে 'সারা ভারত মুসলমান মহিলাদের সম্মেলন' গড়ে তোলেন। পরের বছর ১৯১৭ সালে এই সম্মেলন একটি প্রস্তাব পাস করে। তাতে বলা হয় যে, বহু বিবাহের অবসান আবশ্যক। এই সমস্ত উদ্যোগকে ঐতিহ্যবাদীরা অনুমোদন করেনি; তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য জনসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পণ্ডিতা রমাবাই ও বিদ্যাগোরী নীলকণ্ঠ-এর মত কিছু নেত্রীস্থানীয়া মহিলা অসবর্ণ বিবাহ এবং শিক্ষা লাভের জন্য বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

উপরিউক্ত আন্দোলনসমূহ অভিপ্রেত সুফল প্রসব করতে পারেনি। এর মূল কারণ হল লিঙ্গ বৈষম্য অবসানকে মূল কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সাবেকি সামাজিক কাঠামো এবং জাতপাতের ভেদাভেদ নারীজাতির অবদমিত অবস্থানকে অব্যাহত রেখেছে। এই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহের উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পরিবারের মধ্যেই মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধনই ছিল আলোচিত আন্দোলনসমূহের আশু উদ্দেশ্য।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক ভারতের নারী আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছিল সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কার আন্দোলনসমূহ পরবর্তী কালের নারী আন্দোলনের সম্ভাবনাসমূহের কারণ তৈরী করেছিল। ঘনশ্যাম শাহ (Ghanshyam Shah) তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন: "The origin of the contemporary women's movements in India is often stressed to the social reforms movement within the Hindu fold in the last century." রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বেহরামজি মালবারি প্রমুখ সমাজসংস্কারকগণ মহিলাদের অবদমিত করার কারণ স্বরূপ সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকার সুবাদে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার নারী জাতির কল্যাণে বেশ কিছু সদর্থক আইন প্রণয়ন করেছিল। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল সতীদাহ নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কিত আইন। নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রসমূহে নারীজাতির স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদিতেও মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণের বিষয়ে সমাজ সংস্কারকরা উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

সমাজসংস্কারকগণ এবং মহিলা সংগঠনসমূহ প্রাথমিকভাবে নারী স্বার্থ সম্পর্কিত সেই সমস্ত বিষয়াদি নিয়ে আন্দোলন করেছে যেগুলি বৈদিক ধারণা ভিত্তিক হিন্দু মতাদর্শকে লঙ্ঘন করেছে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকার পৃথকীকরণের ব্যাপারে অধিকাংশ সমাজসংস্কারকই সমমত পোষণ করতেন। বৃহত্তর বিশ্বে মহিলাদের স্বাধীন কর্মজীবনকে তাঁরা সমর্থন করেননি। তবে তাঁরা ঘরের বাইরে মহিলাদের কাজকর্ম করার বিষয়ে বাধা দেননি। নারী পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সামিল হবে এটা তাঁর মেনে নিতে পারেননি।

ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কারকদের কাছে মহিলাদের মর্যাদার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মহিলাদের মর্যাদার বিরোধী হিসাবে কতকগুলি সাবেকি প্রথাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এগুলি হল সতীদাহ, নবজাত শিশুকন্যা হত্যা এবং বিধবা বিবাহে বাধা। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারকগণ এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনকেই তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা নারীশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে এবং জনজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মহিলাদের উপনীত করার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই কিছু ভারতীয় মহিলার মধ্যে এই ধারণা সঞ্চারিত হয় যে, মহিলাদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন আবশ্যক। এই সংগঠনটি মহিলাদের সমস্যাদি নিয়ে কাজ করবে এবং মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ১৯১০ সালে সরলাদেবী চৌধুরানী 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' স্থাপন করেন। তিনি নারী আন্দোলনের সমাজসংস্কারক পুরুষ উদ্যোগীদের সমালোচনা করে বলেন: "They are so called social reformers. They advertise themselves as champions of the weaker sex ; equal opportunities for women, female education and female emancipation are some of their pet subjects of oratory at the annual show. They even make honest effort at object lessons in the above subjects by persuading educated ladies to come up on their platform and speak for themselves. But woe to the women if they venture to act for themselves." [সরলাদেবী চৌধুরানীর '*A' Women's Movement*' শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত হয় 'The Modern Review' পত্রিকায় ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে]।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে 'মহিলাদের ভারতীয় সঙ্ঘ' (Women's Indian Association), 'সারা ভারত মহিলাদের সম্মেলন' (AIWC— All India Women's Conference) প্রভৃতি মহিলা সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এসবের উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। স্বাধীনোত্তর পর্বেও তারা অভিন্ন বিষয়াদি তুলে ধরেছে এবং নারীকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সমভোটাধিকার এবং আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের মত মহিলাদের জন্য রাজনীতিক অধিকারের দাবি উত্থাপন করেছেন মহিলা নেত্রীরা। কংগ্রেস পার্টি এই সমস্ত দাবিকে সমর্থন করেছে।

সমাজসংস্কারকরা বরাবরই দাবি করে এসেছেন যে, মহিলারা পবিত্র, শুদ্ধ ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। স্ত্রীরা হবে পতিব্রতা, সতীলক্ষ্মী এবং পতিপ্রাণা। পতির প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য থাকবে; পতির দোষত্রুটির ব্যাপারে তাদের পরম সহিষ্ণুতা থাকবে। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সম্ভূত মহিলা সংগঠনগুলিও অল্পবিস্তর উপরিউক্ত মতাদর্শের অনুগামী ছিল। সমাজবিজ্ঞানী কল্পনা শাহ (Kalpana Shah) তাঁর *Women's Liberation and Voluntary Action*' (1984) শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে অর্থবহ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "The role of the AIWC in the struggle for the liberation of women is negative. In fact, through its programmes the Parishad (AIWC) strengthens the traditional role of a women as a wife, housekeeper and mother. And despite wishful thinking of the moderate thinkers like gandhi, women's role as a wife is not considered to be equal to man's by women themselves."

কল্পনা শাহ আরও বলেছেন যে, ঘরের বাইরে গৃহবধূকে কাজ করতে বলা হয় কেবল তার স্বামীকে সাহায্য করার জন্য; মানুষ হিসাবে তাঁর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নয়। মহিলা সংগঠনসমূহ সেই সমস্ত মতাদর্শকেই সম্প্রসারিত করে যার মাধ্যমে মহিলাদের অপেক্ষাকৃত হীন ভূমিকা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ সাবেকি মূল্যবোধসমূহকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই সাবেকি মূল্যবোধগুলি মহিলাদের পক্ষে পীড়নমূলক। বিদ্যমান পীড়নমূলক সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রবণতাও এই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

জানা ম্যাটসন এভোরেট (Jana Matson Everett) তাঁর *Women and Social Change in India (1979)* শীর্ষক গ্রন্থে ভারতীয় মহিলাদের সংস্কারবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ রকম সংস্কারবাদী আন্দোলনের চেহারা-চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। এই

বিষয়গুলি হল: (ক) ক্রমস্তর বিন্যস্ত জাত ব্যবস্থা; (খ) হিন্দুধর্ম ; (গ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থা; (ঘ) মুসলমান শাসন, এবং (ঙ) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা। ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্মে মহিলাদের অধঃস্তন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নারী-পুরুষের ধর্মীয় দ্বৈততার নীতি (শক্তি-শিব) এবং প্রাচীন বৈদিক যুগের নারী-পুরুষের সাম্য সম্পর্কিত ধর্মীয় ঐতিহ্য মহিলাদের মর্যাদার উন্নতি সাধনের ব্যাপারে হিন্দু সংস্কারপন্থীদের উদ্যোগকে ন্যায্যতা প্রদান করে।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনাধীনে জাতীয় বুর্জোয়ারা সংগ্রাম করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো এবং মতাদর্শসমূহের বিরুদ্ধে। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরুষ সমাজসংস্কারকরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় যে, অতীতের দাসীসুলভ অবস্থা থেকে মহিলাদের মুক্ত করতে হবে। এই কারণে তাঁরা সাবেকি কিছু পীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হন। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত পত্নীদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারেও তাঁরা উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। ঘনশ্যাম শাহ (২০০৪) এ বিষয়ে বলেছেন: "The goal of the social reformers was to inculcate and entrench the bourgeois norms of monogamy and the nuclear family which are the cornerstones of capitalist development."

৭.৩ প্রাক্-স্বাধীন ভারতে নারী-মুক্তি আন্দোলন (Women-Liberation Movement in Pre-Independence India)

বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে নারী জাতির অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়। তারপর থেকে নারী জাতিকে পুরুষের অধীনস্থ রাখার ব্যবস্থা অবিরাম অব্যাহত। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল এ দেশের নারীজাতির হীনাবস্থার মূল। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের মত প্রতিবাদী সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ নারী জাতির দুরবস্থার লাঘবের ক্ষেত্রে সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। একথা ঠিক। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে নারীজাতির উপর আরোপিত হয়েছে পাহাড়-প্রমাণ সামাজিক-নৈতিক অন্যায়-অবিচার। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তার অপসারণ ছিল অসম্ভব। বস্তুত ব্রিটিশ আমলেই সংগঠিত হয়েছে নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে সদর্থক বড় বড় আন্দোলন।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে নতুন আর্থনীতিক ও আইনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সুবাদে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসে এ দেশের নারী জাতি। ব্রিটিশ আমলে নতুন রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নতুন আর্থনীতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। এই সময় এ দেশের মানুষের মধ্যে পশ্চিমী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নতুন ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ ভারতে এক সাধারণ জাতীয় ও গণতান্ত্রিক জাগরণের সৃষ্টি হয়। এ রকম এক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের মধ্যে ভারতের নারীজাতির বহু শতাব্দীব্যাপী সহ্য করা সামাজিক হীনাবস্থা ও মধ্যযুগীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়।

নারীর মর্যাদার উন্নয়ন || ব্রিটিশ ভারতে নতুন সব অধিকার প্রবর্তিত হয়। তার ফলে বিভিন্ন বাস্তব ও বিষয়শক্তি উন্মুক্ত হয়। সমকালীন ভারতের সামাজিক বিন্যাসের রূপান্তর সাধিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। জনজীবনে নতুন সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সময় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। নারী জাতির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অন্যায়-অত্যাচার, অসাম্য-বৈষম্য, নির্যাতন প্রভৃতির অবসান কল্পে উদ্যোগ-আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। সতীদাহ ও শিশুহত্যার মত অমানবিক প্রথার নির্যাতন নারীরা সহ্য করছে অসংখ্য শতাব্দীব্যাপী। সতীদাহ প্রথার অবসানের পরেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা সহজে চালু করা যায়নি। দেবদাসী প্রথার ন্যায় একটি বর্বর প্রথাও চালু ছিল। সতীদাহ প্রথার অবসানের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক অবশেষে এই অমানবিক প্রথার অবসান ঘটান। কালক্রমে শিশু হত্যাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বাল্য বিবাহের অভিশাপও মূলত মেয়েদেরই সহ্য করতে হত। ১৮৬৪ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ বিরোধী একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স করা হয় দশ। ১৮৫৬ সালে প্রণীত আইনের ভিত্তিতে বিধবা বিবাহ আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৯ সালে 'শিশু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন' (Child Marriage Restraint Act, 1929) প্রণীত হয়। এই আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে করা হয় ১৪ এবং ছেলেদের ১৮।

শিক্ষার অধিকার অর্জন || মধ্যযুগীয় ধারণা অনুযায়ী শুধু পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেই নারীজাতির ভূমিকা সীমাবদ্ধ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে নারীজাতি বঞ্চিত ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পর সুদীর্ঘকালের সনাতন সমাজব্যবস্থা হীনবল হয়ে পড়ে। নতুন এক